ফিলিপ্‌স-সাপ্তাহিক ২০০০

গল্প লেখা প্রতিযোগিতা

বোধিপ্রিয়া

এগারো

ওয়ালিউল আজিম

রাঢ় ভূমির এই অঞ্চলটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এতো উঁচুতে যেন আকাশ ছুঁয়ে যাবে। একটিমাত্র পিচরাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে বহুদূরে কোনো অজানায় মিশে গেছে। এই এলাকাটির নাম সুরেলী। ন্যাশনাল গ্রিড রাস্তার আড়াআড়িভাবে সুরেলীর ওপর দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাড় আর এর ঠিক মাঝখানে প্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছ। আমি এই এলাকায় একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে খুবই আগ্রহী ছিলাম। সুন্দর এক সকালে রাজধানী থেকে সুরেলীর উদ্দেশে আমার নিশান পেট্রোল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাস ছয়েক আগে ব্যবসায়িক কাজে এখানে একবার আসতে হয়েছিল- সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। সে সময়েই এই সুরেলী আমাকে কী যে এক অমোঘ আকর্ষণে কাছে টেনে নিয়েছিল আজ তাই অবাক বিস্ময়ে ভাবি!

তো, এবারো সেই অশ্বত্থ গাছের নিচে, যা রাস্তা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ মিটারের মতো হবে- সেখানে গিয়ে থামলাম। তখন দুপুর। শীত তখনও আসেনি পুরোদমে। আমি গাড়ি থেকে নেমে স্ন্যাকসের প্যাকেট, পানির বোতল নিয়ে গাছের গুঁড়ির ওপর বসলাম। আমার মনে হলো সূর্যের আলো হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে এলো। গাছের ওপর থেকে কিচিরমিচির শব্দে শালিকরা উড়ে গেল। আমি স্ন্যাকসের প্যাকেট খুলে একটা খেলাম তারপর বোতলের ছিপি খোলার আগেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। অশ্বত্থ গাছের পেছন থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। আমি বিস্মিত হলাম। কিন্তু সে মোটেও অবাক হলো না। ধীরে ধীরে ও আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনে পাঁচ ছ'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। আমি পানি খাওয়ার কথা ভুলে গেলাম।

আমি যদি স্বর্গ-নরক, দেব- দেবী বিশ্বাস করতাম তাহলে আমার সামনে দুটো সম্ভাবনা থাকতো। হয় সৌভাগ্য, আর নয়তো সমূহ বিপদ। কিন্তু আমি ছিলাম চরম বাস্তববাদী তিরিশ বছরের এক সাহসী (?) যুবক। দেবী হলে নিঃসন্দেহে ও হতো সৌন্দর্যের দেবী। আর আমি নিশ্চিত জানি ও একজন মানবী। বড় বড় চোখের চাহনি সরাসরি আমার দিকে। ফোলা গাল, সেই মত ওর ঠোঁট। কাঁধে ফ্লাফি চুলগুলো হাওয়া দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। পরনে ধূসর শাড়ি ময়লায় বিবর্ণ কিছুটা। ওর ডান গালে সুরেলীর মাটি আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। সে আমার দিকে স্থির চেয়ে ছিল। কী বিষণ্ন আর হিম সেই চাহনি!

আমিই প্রথম কথা শুরু করলাম। বললাম, আমি রাজধানী থেকে আসছি। এই সুরেলীতে একটা ইন্ডাস্ট্রি বানাবো ভাবছি।

ও এতোক্ষণে মুখ খুললো। বললো, কাছের ওই যে গ্রামটি দেখছেন- আমি ওখানেই থাকি।

ও নিচে দূরের গ্রামটি দেখিয়ে বললো। আর ম্লান হাসলো। হাসির মধ্যবর্তী সময়ে ওর মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো।

এদিকটায় কী করছিলেন আপনি? অনধিকার চর্চা হলেও জিজ্ঞেস করলাম।

ও নির্বিকারভাবে বললো, এই সুরেলীতে ইঁদুর জাতীয় ছোট ছোট প্রাণী পাওয়া যায়। এই যে দেখুন, বলে সে আমাকে তার কাঁধে ঝোলানো বস্তুটি দেখায়। এতোক্ষণ ওটা আমার নজরেই আসেনি। আমি দেখলাম, সত্যি তাই। ঝোলার মধ্যে ক্ষুদ্র ইঁদুরের মতো প্রাণী। প্রেমিকা বা স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখার মধ্যে এক ধরনের নিজস্বতা থাকে যা অন্য কাউকে দেখার মধ্যে থাকে না। কিন্তু আমি এ মুহূর্তে এই জনমানবশূন্য সুরেলীর এই মেয়েটিকে দেখলাম সেই দৃষ্টিতে। ওর ছায়া, ব্লাউজ, শাড়ি সব কিছুই ধুলোয় মলিন। নগ্ন পা-জানি না কত কাঁটা আর আকরিকের ঘা সয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে অপার্থিব মনে হলো।

ও আবার মুখ খুললো। বললো, এদিকে এই বিরান ভূমিতে কিছু না করলেই ভালো করবেন। এই উঁচু ভূমিতে কোনো ফসল হয় না। অবশ্য করণের দিকে এরকম ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে।

কী রকম?

আপনি হয়তো এগ্রোবেজ্‌ড ইন্ডাস্ট্রির কথা ভাবছেন? সেটা তো করণেই ভালো হয়। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সেখানে পাবেন।

আমি ওর কথা শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। সেটা এ কারণে যে, অজপাড়াগাঁয়ের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত এক মেয়ে আমাকে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে দেখে।

আপনি এতো সব জানলেন কোত্থেকে? আমার রাগ তখনো কমেনি।

রাগ করবেন না প্লিজ। আমি করণে ল্যাম্বার্ট ইউনিভার্সিটিতে এগ্রো-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সবে পড়াশোনা শেষ করেছি। আমি সেহেল উপজাতির মেয়ে।

আমার বিস্ময়বোধ সম্ভবত চরমে। আমি ওকে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম।

ও বললো, ওভাবে কী দেখছেন?

ওর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম, তা এখানে কি ইঁদুরের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীই জন্মে না অন্য কিছু...?

এখানে শুধু মাঞ্চুই (মাঞ্চু বলতে নিশ্চিতভাবে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীকেই বোঝাতে চাইছে) জন্মে না-এখানে প্রচুর বিষধর সাপের বাস, আর সেটা আপনার জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

আমি হঠাৎই যেন দমে গেলাম। কারণ এই জিনিসটায় আমার খুব ভীতি। পারতপক্ষে আমি এর নামই নিই না।

Philips Lighting
PHILIPS

কিন্তু আমি আমার আভিজাত্য বজায় রাখতে চাইলাম। গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'এক ঢোক পানি খেয়ে বোতলের ছিপি লাগাতে লাগাতে ঠাট্টার সুরে বললাম, আর আপনি বুঝি সাপ মেয়ে? দ্যাট মিন্‌স স্নেক ওম্যান।

মানে? সে আমার দিকে ঠান্ডা চোখে চেয়ে থাকলো।

নাক চুয়াঙ পেইকের গল্প পড়েননি। যার নায়ক সাপ মেয়ের কবলে পড়েছিল? এবং মেয়েটির জিভ ছিল সাপের জিভের মতো ছুঁচলো আর চেরা । আমি হেসে বললাম।

আমার জিভ কি চেরা, দেখুন তো? সে তার জিভটি বের করে দেখায়।

আমি লজ্জা পেলাম তার সুন্দর আর স্বাভাবিক জিভটি দেখে। তারপর সে সুন্দর করে হাসলো।

আমিও স্নান হাসলাম। বললাম, আমি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, আপনাদের গ্রাম দেখতে নিয়ে যাবেন না? উপজাতিদের জীবনযাত্রা দেখা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো। বললো, আমরা সেহেল উপজাতিরা কখনও বাইরের লোকদের সঙ্গে মিশি না।

শুধু আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত যুবক ছাড়া। আমি শেষটুকু যোগ করলাম। তারপর দু'জনই হেসে ফেলাম। সলজ্জ চোখে ও আমার দিকে তাকাল। তখন মনে হলো ও স্বাস্থ্যবতী। আর আমার দেখা জীবনের সব চাইতে সুন্দর রমণী।

আমি যাচ্ছি । ও চলে যেতে চায়।

কাল আবার এখানে দেখা হবে তো?

হতেও পারে। কিছুটা দুষ্টুমির হাসি দিল ও । আমি গাড়িতে ওঠার আগে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ও তার ঠোঁটের কোনা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কী যেন ভেবে নিল চকিতে। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বেশ শীতল সে হাত। কিন্তু তা আমার মধ্যে এক উষ্ণ অনুভূতির সঞ্চার করলো। আমি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

পরদিন আমি আবারো সুরেলী এলাম। আবারো সেই অশ্বত্থ গাছ। আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল- ও আসবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ও আর আসবে না ভেবে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলাম, ঠিক তখনই গাড়ির ব্যাকভিউ মিররে ওকে লক্ষ করলাম। স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। গতকালের সেই বেশভূষা কিন্তু কালকের অদ্ভুত ঝোলাটি আজ নেই।

আপনার নাম তো জানাই হয়নি গতকাল। হেসে বললাম আমি।

বোধিপ্রিয়া; কিন্তু শুধু কি নাম জানতেই আবার ছুটে এসেছেন? মুখ নিচু করে কথাটা বলেও আমার দিকে তাকালো; তারপর চকিতে মুখ নামিয়ে নিল।

ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলাম। তারপর বললাম, না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে, গল্প করতে এলাম। অপরাধ করলাম কি?

করেননি তবে করবেন বোধহয়। হাসিতে ছলকে উঠে ও । বুক কেঁপে গেল হাসির দমকে। আপনার নামতো এন জে প্রনন? ও জিজ্ঞেস করলো।

আমি অবাক হলাম। আপনি জানলেন কী করে?

ফোন নম্বর ও বলে দিব? অপূর্ব সুন্দর লাগছে ওকে। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই ও আমার ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দেয়।

কোথায় পেলেন এটা?

আপনার ক্যামেরার খোল থেকে পড়ে গিয়েছিল। নির্বিকার জবাব ওর।

কিন্তু আপনি দেখলেন কী করে; সে সময় তো আশপাশে ছিলেন না? আমি বিস্মিত হলাম ব্যাপারটায়।

লয়্যারদের মতো প্রশ্ন করবেন নাতো। কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে ও । আমি প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালাম। বোধিপ্রিয়া আমার খুব কাছাকাছি বসে আছে। সিগারেটের গন্ধ পাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার শরীর থেকে আসা অদ্ভুত সুগন্ধ পাচ্ছিলাম- যা নিশ্চিত ভাবেই কোনো পারফিউমের নয় আবার মাটির সোঁদা গন্ধও নয়। এই গন্ধ আমাকে ক্রমান্বয়ে বিবশ করে দিচ্ছিল আর হয়তো তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই অবচেতন মনে আমি সিগারেট ধরালাম।

কী সব খাচ্ছেন আমার চোখ জ্বালা করছে। বোধিপ্রিয়ার কণ্ঠে অভিমান।

মাফ করবেন, আপনার কষ্ট হবে বুঝতে পারিনি। আমি সিগারেট নিভিয়ে দিলাম।

ও কী ভেবে বললো, ঠিক আছে আপনি খাবেন, আমি তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবো।

আমি ওর কথায় চমকিত হলাম। বললাম, আপনার সঙ্গে কি আরো অনেকবার দেখা হবে?

হ্যাঁ হবেই তো। আপনি আমাকে ছাড়া থাকতেই পারবেন না। ও নির্বিকারভাবে বললো।

ল্যাম্ববার্ট থেকে কোন বছর বের হয়েছিলেন? আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলাম।

এ বছরেই। আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন? সুরেলীতে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবেন?

হ্যাঁ আমি তো ও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি।

পরিকল্পনাটা ত্যাগ করুন প্লিজ। এখানে যে পরিবেশ আছে তা নষ্ট করবেন না। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বোধিপ্রিয়ার ব্যাকুলতা আমার মন ছুঁয়ে গেল। ও ওর স্বজাতিকে রক্ষা করতে চাইছে। এটা ওর উচ্চ শিক্ষার প্রতিফলন হতে পারে। তবে এও বুঝলাম, ও এক ধরনের আবেগ দ্বারা চালিত হচ্ছে।

ওর সঙ্গে আমার যত সময় কাটছে ততই আশ্চর্য হচ্ছি ওকে দেখে। শুধু উচ্চ শিক্ষাই ওর মতো একজন সুন্দরী যুবতীকে এতো কাছে এনে দিতে পারে না। ওর সমাজ এবং সম্ভবত ধর্মীয় সেন্টিমেন্টও সেটা সমর্থন করবে না। তাহলে কেন আমার প্রতি ওর এমন দাবি।

আমি ওর সঙ্গে রসিকতা করতে চাইলাম। বললাম, তার বিনিময়ে আমি কী পেতে পারি?

ও আমার দিকে তাকালো। চোখে চোখ রেখে বললো, আমার সমাজের কাছে আপনার চাইবার মত কিছু নেই। আর আমার কাছে কি চাইবেন? আমাকে তো? নিতে পারেন।

আমি মুহূর্তে অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। আরে না না। আমি ওভাবে কিছু বলতে চাইনি। রাগ করলেন না তো?

কেন? আমাকে আপনি চান না? কী নেই আমার?

ল্যাম্ববার্টে আপনাকে দেখে কেউই পাগল হয়নি? কিংবা এখন এখানে? আমি ওর পাগলামো দেখে হেসে ফেললাম। কিন্তু ও আমার দিকে সেই হিমশীতল চোখে তাকালো। ওকে আরো ভালো লাগছে।

ও বললো, আমি সে সময় খুব আগ্‌লি ছিলাম।

কেমন? এই তো একটু আগে বললেন এ বছরেই ল্যাম্ববার্ট থেকে বের হলেন তখন আগ্‌লি মানে কুৎসিত ছিলেন? ছিলামই তো। আমি কি রূপ দেখাতে সেখানে গিয়েছিলাম, না পড়াশোনা করতে?

স্ট্রেইঞ্জ!

তাহলে আমরা চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে পারি। আমি আপনার হয়ে যাচ্ছি এবং বিনিময়ে আপনি সুরেলী ছেড়ে দিবেন। ঠিক আছে?

আচ্ছা ছেড়ে দিলাম। আপনি কি আমার সঙ্গে রাজধানীতে যাবেন? আমি সত্যিই সিরিয়াস হয়ে গেলাম। যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাবেন। দেখবেন আমি আপনার খুব অনুগত। ও এবার দুষ্টুমির হাসি হাসলো। আমি ওর ঠান্ডা হাত স্পর্শ করলাম। কোমল চুল স্পর্শ করলাম। কোমর স্পর্শ করলাম। তারপর হাতে চুমু খেয়ে আমি দাঁড়ালাম। বললাম, ঠিক আছে, আমরা পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখব আশা করি।

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

কাল্পনিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত

মার্শিয়া তাসমীম আকবর

বারো

আটই মার্চ, শুক্রবার, ২০০২ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এবং দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে শহীদ মিনারের পাদদেশে আজ এক ব্যতিক্রমী আয়োজন। 'পুরুষের অঙ্গীকার নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ নয় আর' এ স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে একটি র‍্যালি, গন্তব্য শহীদ মিনার থেকে প্রেসক্লাব। প্রায় একশ এসিডদগ্ধ নারীর হাতে হাত রেখেছে, পায়ে পা মিলিয়েছে সচেতন নাগরিক সমাজ নারী ও পুরুষ। বসন্তের মিষ্টি সকালে অগনিত মানুষের মাঝে একটি মুখ 'অমৃতা', হেঁটে চলছে মিছিলের পায়ে পা মিলিয়ে। কালো চশমায় ঢেকে নিয়েছে তার এসিড গদ্ধ বিকৃত মুখ। গানে বাজনায় মুখরিত পরিবেশ। অমৃতার মন আজ কেন যেন হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের উল্টো দিকে, স্মৃতির পাতায়। স্মৃতির জোয়ার যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতীতের সমুদ্রে, অমৃতা আজ তার নিজের গল্প বলবে...

আমার বাবা নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের একটি সরকারি স্কুলে ইংরেজির শিক্ষর। মা আর ছোট দু'ভাই এ নিয়েই আমাদের সংসার। বাবা অর্থের ভান্ডার গড়ে তুলতে পারেননি তবে রেখেছিলেন 'অমৃতা'। মনে পড়ে ছেলেবেলায় প্রায়ই বলতেন, 'তুই যে অমৃতা' অস্ত্রে কাটে না, অগ্নি দহে না যারে'। এসিডের কথা তার মনেই আসেনি। সংসারে প্রাচুর্য পাইনি। তবে ভালোবাসার মিষ্টি বাতাস আর জ্ঞানের মহিমায় অন্তর পরিপূর্ণ করে বেড়ে উঠছিলাম। শৈশবে খেলা বলতে ছিলো একটাই- পুতুল খেলা। বাড়ির উঠোনে ছড়িয়ে বসতাম পুতুলের বিশাল সংসার নিয়ে। বাবা পুতুল, মা পুতুল , বাচ্চা দাদা-দাদী, নানা-নানী, কাজের লোক কোনটাই বাদ ছিল না পুতুলের সংসারে। কাপড়ের পুতুল তাই ওগুলো বানাতে চাই রঙ বেরঙের কাপড়, তাছাড়া শাড়ি জামা তাতো লাগবেই সেজন্য ছুটতাম দর্জির দোকানে। টুকরো কাপড়ের পোটলা দর্জি চাচা যখন মৃদু হেসে হাতে তুলে দিতেন মনে হতো সমস্ত পৃথিবীটাই রয়েছে ওর মধ্যে। দ্রুত খুলে দেখতে হবে সমস্ত রহস্য, তাই দৌড়ে ছুট বাড়ির দিকে। কলমী লতা, শিমের ফুল দিয়ে রান্না-বান্না, রঙীন কাগজ দিয়ে ঘর সাজানো। আমার পুতুলের সংসারে দুঃখ কষ্টের বালাই ছিলো না। মানুষের কল্পনার জগৎটা আসলে দুঃখহীনই হয়। কল্পনায় কষ্টের স্থান থাকে না।

পায়ে পায়ে দরজায় এসে দাঁড়াল কৈশোর। মনে পড়ে পুতুল ছেড়ে তখন মন বাঁধা পড়েছে গল্পের বইতে দস্যু বনহুর আরও কত কি, বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরানোই দায়। পড়ার বইয়ের ভেতর গল্পের বই রেখে বাবার চোখকে কত ফাঁকি দিয়েছি। বাবা তবে ঠিকই বুঝতেন, বলতেন 'জ্ঞান মহাকাশের মতো অসীম, এর উৎস নির্দিষ্ট করে নিলে খন্ডিত বিদ্যা মিলবে, পুরোটা নয়'। সে সময়টা গেছে বই পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প বেড়ানো আর স্বপ্ন দেখে মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে আকাশে উড়বার স্বপ্ন।

বড় রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে স্কুলের সরু পথটার দিকে ঠিক সেই মোড়ে ছেলেগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। স্কুলে যাওয়া আসার পথে লক্ষ্য করেছি প্রায়ই আমাকে দেখে গান গাইতো, হাসতো, কটুক্তি করতো। এগিয়ে যেতাম, কাজ কি এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। কিন্তু দিনে দিনে যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছিল। একটা ছেলে প্রায়ই সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকাতো, চিঠি ছুঁড়ে দিত। কাউকে কিছু বলিনি। পাছে বাবা জানবেন, কষ্ট পাবেন, পাছে মায়ের উৎকণ্ঠা বাড়বে এসব ভেবে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। সহ্য করাটা যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বসে আছি, হঠাৎ জানালা দিয়ে কে যেন ছুঁড়ে দিল এক টুকরো কাগজ, একটা চিঠি। চিঠির ভেতরে অশ্লীল বাক্য, অসংখ্য ভুল। তাড়াতাড়ি ছিড়ে ফেলে দিলাম ঐ জানলা দিয়েই, তখনই চোখে পড়লো ছায়াটা। আবছা আলোয় ছেলেটার চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। ভয়ে আমি যেন মরে যাচ্ছিলাম। পরদিন স্কুলে যাবার সময় ছেলেটি পথ আটকে বললো 'চিঠির জবাব চাই। দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কেঁপে উঠেছিল সমস্ত শরীর। এভাবেই বেশ কিছু দিন গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যায় মা আমার বিছানায় এসে বসলেন। মায়ের চোখ দুটো কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল। বলেন, 'ছেলেগুলোকে কি তুই চিনিস?' আমি চমকে উঠলাম। মায়ের কাছে জানলাম আজ ছোট ভাই বাবুর কাছে কতগুলো ছেলে একটা চিঠি দিয়েছে, বলেছে আমাকে দিতে। চিঠিটা বাবু মাকে দিয়েছে। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

সব খুলে বললাম মাকে। বুক থেকে যেন একটা বিশাল পাথর নেমে গেল। মাথায় হাত রেখে মা বললেন 'ধৈর্য ধর। তোর বাবাকে সব বলবো, গ্রামের সবাই ওনাকে চেনে সম্মান করে, উনি অবশ্যই কিছু করতে পারবেন। সান্ত্বনায় বুকটা ভরে উঠেছিল। পরদিন বাবার কাছে জানতে পারলাম ঐ ছেলেটার বাড়ি পাশের গ্রামে। বাজারে একটা দোকান আছে। প্রচুর টাকা। টাকার প্রধান উৎস সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি। সিদ্ধান্ত হল পাড়ার বয়স্করা মিলে ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলবে। গুরুজনদের কথা ছেলেটা নিশ্চই শুনবে। তাকে বুঝিয়ে বলাও হয়েছিলো, মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উক্ত করায় গর্বের কিছু নেই, মানুষের মতো মানুষ হও ইত্যাদি। এ সমস্ত জ্ঞান সর্বস্ব কথার অর্থ একজন সন্ত্রাসী কি বুঝবে? আমার কাছে গুরুজনদেরই বড় মূর্খ মনে হল।

সেদিন ছিলো জুন মাসের দুই তারিখ, ১৯৯৮। একাই যাচ্ছিলাম স্কুলে। ছেলেটা সামনে এসে বললো আমার কথায় রাজি না হলে তোকে তুলে নিয়ে যাব'। রক্তবর্ণ চোখ। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল আমার। আর বিরক্ত করলে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিব' শুধু এটুকুই বলেছিলাম। এতটুকু কথাই যে কেড়ে নেবে আমার অনাগত ভবিষ্যৎ এরকমটা ভাবারও অসাধ্য ছিলো। ফিরছিলাম স্কুল থেকে, সঙ্গে আরো দু'জন সহপাঠী। রাস্তার ঐ মোড়টাতেই দাঁড়িয়ে ছিলো ছেলেটি। ভয়েই অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। তখন দুপুরের শেষ দিক তাই আশে পাশে তেমন লোকজন ছিলো না। কোনো রকমে ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কি যেন এসে পড়লো মুখে। চোখ অন্ধকার হল। তীব্র জ্বলনে মুখের সমস্ত চামড়া, মাংস যেন গলে খসে পড়ছিল। কি ভীষণ যন্ত্রণা। আমি চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। তারপর... মনে পড়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা। যন্ত্রণার উৎসটা ঠিক কোথায় বুঝতে পারছিলাম না। বাবা, মা, নার্স সবার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। বাবা যেন এরই মধ্যে একশ' বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

বাড়িতে এলাম। এতদিন অবশ্য বোঝা হয়ে গেছে আমি এসিড দগ্ধ নারী। নিজের বিকৃত মুখখানি যেদিন প্রথম আয়নায় দেখলাম, চমকে উঠিনি, সে দৃশ্য আমার চমকেরও উর্ধ্বে ছিলো। মাতৃগর্ভের দশ মাস দশ দিন আর ষোল বছর ধরে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা জীবনটা মাত্র আট/দশ টাকার একশিশি এসিডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল! কেন এমন হল? প্রশ্ন আর উত্তর খোঁজা, ভাগ্যকে দোষারোপ, এ ছাড়া আর কিছু কাজ রইল না। নির্বাসিত হলাম। হারালো কৈশোর, স্কুল জীবন, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে ভরা বিকেল, সন্ধ্যার স্বপ্ন আর রাতের নিশ্চিন্ত ঘুম। সহমর্মিতা করুণা যাও ছিলো প্রথম দিকে সে সবও হারালো ধীরে ধীরে। আমি হয়ে গেলাম একটা কুৎসিত বস্তু, সংসারে যার প্রয়োজন নেই। সমাজের অশোভনীয় একটা অংশ। বাবা কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কখন স্কুলে যান, কখন ফেরেন, কোনো সাড়া পেতাম না। পাবইবা কি করে, আমি মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

নিজের ছোট্ট ঘরটার এক কোণে। ঘরের বাইরে মায়ের দীর্ঘশ্বাস, ভাইদের ভয়ার্ত দৃষ্টি, প্রতিবেশীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আশাহীন, ছন্দহীন, গতিহীন আমি বেঁচে থেকেই মরে গেলাম। আমার কাছে সময় স্থির হয়ে রইল।

আর লেখাপড়া করা হবে না, সংসার হবে না স্বপ্নের রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে যাবে দ্বিগুণ বেগে। আমি সব কিছু হারালাম অথচ আমার জীবনটাকে যে নষ্ট করে দিল সে আজও তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে সেই রাস্তার মোড়ে। হয়তো ছুঁড়ে দেয় নীল চিঠি অন্য কোনো জানালায়। প্রমাণের অভাবে, সাক্ষীর অভাবে তার কোনো বিচার হয়নি। ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে সাক্ষী প্রমাণ সব কিনে নিল, আর আমি বেঁচে রইলাম বিকৃত মাংস পিন্ড হয়ে আশাহীন অন্ধকার জগতে।

দীর্ঘ চার বছর পর রাতের অন্ধকারে শেষে সূর্যোদয়ের মতো যেন আজকের দিনটি এলো, বিশ্ব নারী দিবস, ২০০২। আমাদের নিয়ে আজ র‍্যালির আয়োজন। আমরাই মতো শত শত অমৃতার জমাট বাঁধা কষ্ট অগণিত মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে আজ। এসিড নিক্ষেপকারী নরপশুদের ঘৃণা জানাতে শাস্তির দাবিতে আজ কত মহাপুরুষের ভিড়। আজকে কখন শহীদ মিনারের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম, কই, কেউ তো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলো না। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি আর একা নই, আমার হাতে আছে গণ মানুষের হাত। আমি আবার লেখাপড়া করবো। আমিও বাঁচতে চাই সকলের মতো স্বপ্ন বুকে নিয়ে আর বিচার চাই বিচার চাই সেই সব ঘৃণ্য অপরাধীদের যারা নির্দ্বিধায় জ্বালিয়ে দিতে পারে মানুষের জীবন।

গন্তব্যে এসে গেছি, সামনেই প্রেসক্লাব। চোখ থেকে চশমা খুলে নিলাম। আর চশমার মুখ ঢাকা নয়। দুপুরের সূর্য প্রখর তাপ ছড়াচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর মুখ। আজ আমি সূর্যের আলোয় পোড়ার আমার সর্বাঙ্গ। এ আলোয় হবে আমার নবজন্ম। এ যে আমার 'আশার আলো'।

র‍্যালি শেষ হল- শুরু হল অমৃতার আশার আলোয় আলোকিত জীবন।

অজস্র নক্ষত্রময় অন্ধকার

ইফতেখার মাহমুদ

তেরো

আমি রূপান্তর দেখেছি অনেক।

চোখের সামনে পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে গেছে এক সঙ্গে চলা ঝাঁকভরা জোনাক। আমি দেখেছি অন্ধকারের ফিকে হয়ে আসা, দেখেছি অত্ত বড় সূর্যটাকে রাত্রি একাই আস্ত গিলে ফেলে। আমি চুপচাপ শুধু দেখে গেছি।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে, হঠাৎ করেই আমার আব্বা মারা যায়- খুব তড়িঘড়ি করেই যেন হাতে একদম সময় নেই। ভয়াবহ দুর্দশাগুলো অনুভব করবার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার আমরা কেউই তা পাইনি। আর অনুভূতিও তখন কেমন যেন আচ্ছন্ন ছিল- বেদনাটুকু বুঝতেই পারিনি।

আমার মনে আছে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম-

আমার আব্বা মারা গেলেন!

মৃত্যু এতো সোজা একটা ব্যাপার!!

এতো সহজসাধ্য!!!

আমার ছোট বোনটার বয়স তখন পাঁচ- সেও বোঝেনি তার বিপর্যয়। আমি ওর চে' বড় কিন্তু ঠিক যেন বড় নই। পিতৃ বিয়োগে আমি সেদিন দুঃখিত হইনি, হয়েছি বিস্মিত।

আমার মা'র কথা বলি। তিনি সাদামাটা একজন মহিলা। দুপুর বেলা ভাত খেয়ে যারা শুক্রবারে বাংলা সিনেমা দেখতে বসে সেই গোছের মানুষ তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবে নিজের জীবনটা যাপন করে চলছিলেন। সবচে' বড় ধাক্কাটা তারই লাগার কথা- হলোও তাই। এতো অল্প বয়সে স্বামী হারানোর যন্ত্রণা এবং সম্বলহীন স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানসহ তার দুর্দশা তাকে যুগপৎ বিপন্ন এবং কাতর করে ফেলল, কিন্তু যেহেতু তিনি সাধারণ রমণী এবং এ সমাজে বেড়ে উঠতে উঠতে শোক প্রকাশের একটাই পন্থা তার শেখা হয়েছে-

তাই তিনি খাদ্যগ্রহণ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। আমার মনে আছে আমিও দুদিন কিছু খাইনি। বাবার মৃত্যুতে সন্তানের কি করে শোক প্রকাশ করা উচিত তা না জানা থাকায় আমিও মাকে অনুসরণ করেছিলাম ঘটনাটার ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে।

মা কিন্তু জীবনের ছন্দে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। আসলে ফিরে আসতে হয়। জীবন নানা রকম ফাঁদ পেতে রেখেছে। এড়াতে চাইলেও তুমি তা পারবে না। ফাঁদগুলোর চমৎকার সব নামকরণও রয়েছে : ভালোবাসা মমতা, স্নেহ, কর্তব্য। তোমাকে সে টানবেই।

আমার মা হাল ধরলেন।

যথেষ্ট সরল সোজা অতি বাঙালি এক রমণী কি করে কি করে যেন একটা চাকরি যোগাড় করে ফেললেন। শুধু তাই না, এই রাজশাহী শহরে অল্প টাকার একটা বাড়িও যোগাড় করা হলো।

এবং কি আশ্চর্য যাবতীয় ইতরামির মধ্যে থেকেও আমরা মানুষ হিসেবে বড় হতে থাকি। কিংবা আদৌ হয়তো বড় হইনি অথবা মানুষ।

সে কথা এখন থাক।

আমার সাথে তো আপনাদের পরিচয় নেই।

আমি ছোঁয়া। এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ি। সোসিওলজিতে।

আমি মানুষটা পুরোপুরি আমার নামের উল্টো। আমার নাম হওয়া উচিত ছিল অ- ছোঁয়া কিংবা অস্পৃশ্য জাতীয় কিছু। অথচ আমার নামই হয়েছে ছোঁয়া। আমি নিজেই কখনো নিজেকে ছুঁতে পারিনি। শুধু আমাকে নয়, কাউকেই পারিনি এবং কেউ আমাকেও না।

মানুষের মনের মধ্যে অনেকগুলো দরজা থাকে। কারও কারও দরজা বাইরে থেকে খোলা যায়, কারোরটা ভেতর থেকে। আমার দরজাগুলো ভেতর থেকে তালাবদ্ধ। আর সেই তালার চাবি আমার কাছে নেই। বাইরে থেকে যখন কেউ ধাক্কা দেয় আমি না পারি দরজা খুলতে, না পারি তাকে ফিরিয়ে দিতে। আমি, ছোঁয়া নামের চব্বিশ বছরের এই মেয়েটি, বড় বিপন্ন বোধ করি।

বছর দুয়েক আগে একটা ছেলের সাথে আমার 'প্রণয়' ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একুশ বাইশ বছরের ছেলে মেয়েরা যে ভাবে হাত বাড়িয়ে একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে আমাকেও সেভাবে, আবীর নামের একটা ছেলে আঁকড়ে ধরেছিল।

আবীর আমাকে ভালোবাসত। অন্তর দিয়েই ভালোবাসত।

আমরা দুজনই আমাদেরকে সর্বোচ্চ সময় দিয়েছি, প্রবলভাবে চেয়েছি কাছে আসতে কিন্তু হয়নি। বায়ুর নাম বদলে ছোঁয়া রাখলেও তাকে তো আসলে ছোঁয়া যায় না।

প্রেম বিষয়টা সম্পর্কে বই পড়ে পড়ে আমার একরকমের ধারণা তৈরি হয়েছিল এবং অতি- লৌকিক অভিজ্ঞতা থেকে ধারণাটা দৃঢ় হয়ে হয়েছে বিশ্বাস। প্রেম আসলে যতটুকু না শারীরিক ব্যাপার তারচে' ঢের বেশি মানসিক; এবং এ কারণেই এটি একটি বিমূর্ত ব্যাপার। প্রেম কখনোই ভালোবাসা নয়। কেন যে শব্দ দুটো সমার্থক হয়ে গেল!

প্রেম আসলে সত্যিকার অর্থে আনুগত্য। এবং আনুগত্যের হাত ধরেই ত্যাগ স্বীকার। সকল প্রেমেই থাকে একজনের আত্ম নিবেদন। নিজেকে সমর্পনের তাগিদ থেকেই মানুষ প্রেমে পড়ে। সমর্পণ থেকেই আসে আনুগত্য।

আমি আমার বন্ধু বান্ধবী অনেককে প্রেমে পড়তে দেখেছি। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই কী এক কানামাছি খেলায় মেতেছে- কী কপটতা সবখানে!

আবীর আমাকে বুঝেছিল, যতটুকু বোঝা সম্ভব, কিন্তু আমরা কেউই কারও প্রতি অনুগত ছিলাম না- আমাদের সম্পর্ক ছিল ভালোলাগার;

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

মমতারও। তাই যা হতে পারত তা হলো না।

তবে আমার মা কিন্তু আমার অন্যরকম আপনজন। তিনি অন্য সব মায়েদের মতোই এবং অন্যসব মায়েদের থেকে আলাদাও বটে। আমাদের ঘিরে মা'র অদ্ভুত সব কান্ড কারখানা।

ধরা যাক, আমার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠেছে-

মা গম্ভীর মুখে বলবেন- ও তো বাচ্চা মেয়ে, এখনও কিসের বিয়ে!

হয়তো মা চাইতেন আমি পড়াশোনা করি কিংবা হয়তো মনে করতেন বিয়ে হয়ে গেলেও আমি দূরে চলে যাবো।

কোরবানি ঈদে আমার মা খুব লজ্জায় পড়ে যেতেন। আমার বান্ধবীরা আমাদের প্রতিবেশিরা সকলেই কোরবানি করত, আমরা করতাম না- এ নিয়ে মার যেন লজ্জার শেষ নেই। তিনি ঈদের সকালে জমানো টাকা দিয়ে মাংস কিনতেন কয়েক কেজি। ঈদের দিন সকাল থেকেই মাংস কাটাকুটি নিয়ে প্রবল ব্যস্ত। আসলে দু'কেজি মাংস রান্না নিয়ে মা'র যে ব্যস্ততা তার পুরোটাই কপট, অথচ কী মধুর সে দৃশ্য। মা'র এই অকারণ ব্যস্ততা দেখে আমার দুঃখও লাগত। মাকে আমি আমার দুঃখ বুঝতে দিতাম না। মাও তার টুকু আমাকে নয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায়।

আমার চাচারা গ্রামে থাকে। বাবার প্রাপ্য সম্পত্তির কিছু অংশ মা পেয়েছে- কিছু অংশ ভূতে। সেই সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য মাকে প্রায়ই গ্রামে যেতে হতো। স্বামীর মৃত্যুর পরই মা তার শ্বশুরবাড়িতে জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন। এবং সেটা ফসলের জন্যই। ফসল থেকে আমাদের খুব বেশি কিছু আসে না কিন্তু যা আসে তাই আমাদের কাছে পরমাকাংক্ষিত। তাই মা'র আমাদের ছেড়ে থাকাটা আমাদের দুবোনেরই সয়ে গেছে।

আমার সহনীয়তার নির্দয় পরীক্ষা বারবারই প্রকৃতি নেয়। আবারও সে বেশ এক আয়োজন করে আমার জন্য।

মা এবং আমার দূর সম্পর্কের এক চাচাকে জড়িয়ে নানা রং বেরং-এ কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার কিঞ্চিৎ আমার কানেও এসেছে।

আমার মা আমাদের কী দিয়েছেন আমাদের জন্য তার কী আত্মত্যাগ রয়েছে তা আমরা দু' বোন মর্মে মর্মে জানি। এরকম কানাঘুষায় আমরা দু বোন গভীরভাবে আহত হলাম।

আমরা সব সময়ই ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইতাম, যেন এই বিশ্রী কথাগুলো দু' বোনের কেউ শুনিনি।

সবকিছু স্বাভাবিক চলছিল, যেমন চলে। হঠাৎ সেদিন মা আমাকে বললেন তার এক অসুখের কথা। জটিল অসুখ। এ অসুখ থেকে বাঁচার একটাই উপায় বিয়ে করা। শুনতে অসুন্দর শোনলেও চিকিৎসা শাস্ত্র এই অসুখের জন্য শারীরিক সঙ্গমকে নিরাময় প্রদানকারী বলে শনাক্ত করেছে।

আমি সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মা আমার মতামত চান। এবং পাত্র ঐ দূর সম্পর্কের চাচাই। কী আশ্চর্য!

আমি এই ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি।

বাবার মৃত্যুর পর মা'র যে জীবন কেটেছে তা অস্বাভাবিক, অসম্পূর্ণ। একজন নারীর এবাবে বেঁচে থাকা আমি সমর্থন করি না। কিন্তু তিনি যখন আমার মা, তখন আমার যুক্তি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যায়-

আমার মনে হতে থাকে এই তো স্বাভাবিক।

মার হয়তো শারীরিক অসুস্থতার কারণেই বিয়ে করা জরুরি। [আমি 'হয়ত' শব্দটা ব্যবহার করেছি অসচেতনভাবেই। তবে কি আমার মধ্যে সংশয় রয়েছে- রয়েছে অবিশ্বাস?]

ধরে নিই যে, শারীরিক অসুস্থতা অংশটুকু বানানো- কিন্তু তারপরও তো অনেক কথা থেকে যায়।

আমার বিয়ে হয়ে যাবে, ছোটটারও- মা'র কি হবে তার পর?

ধরে নিলাম, ঐ চাচার সঙ্গে মা'র একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা নিজেদেরকে নিজেরা হয়তো ভালোওবাসে- চক্ষুলজ্জা ঢাকতে মা শারীরিক অসুস্থতার অংশটুকু বানিয়েছেন- এখন তারা যদি বিয়ে করতে চায় মানবিক কারণেই তো আমার মত দিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু আমি তা পারি না। আমার নিজেকে খুব ঠকে যাওয়া মানুষ মনে হতে থাকে।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়-

জীবন তো গল্পের চেয়েও বিচিত্র।

নিজে যখন কোনা ছোট গল্প পড়ি, লক্ষ্য করে দেখি গল্পকাররা কী বিচিত্র সব ঘটনা ঘটিয়ে দেন, খানিকটা কল্পনা থেকে খানিকটা অভিজ্ঞতার শক্তি থেকে।

ওসব গল্প আমার বিশ্বাস হতো না, যদিও মুগ্ধ হতাম। আজ জীবনের এই জায়গায় এসে মনে হচ্ছে- গল্পের চেয়ে জীবন অনেক বেশি গল্পময়।

জীবনে অজস্র ছোট গল্প থাকে, বৈচিত্র্যে সেগুলো আরও নির্দয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একজন বড় বন্ধু আছে। ঠিক বন্ধু নয়, আশ্রয়। চিঠি লিখেই তার সাথে আমার হৃদ্যতা। সামনা সামনি আমাদের কখনো দেখা হয়নি, কাগজে কলমেই আমরা পরস্পরের চেনা। তিনি একই সঙ্গে আমার বন্ধু এবং শিক্ষক। আমাদের সম্পর্কটা শ্রদ্ধায় মমতায় মাখানো। তার নামটা বলতে চাচ্ছিলাম না- বলেই দিই সেলিম রেজা নিউটন।

যেদিন আমার মা'র বিয়ে হয়ে গেল সেদিন ওনাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলাম। গতকাল তার উত্তর পেয়েছি-

প-৮৮/এফ
রা.বি আবাসিক এলাকা

স্নেহের ছোঁয়া

তোমার চিঠিটা দুপুরে পেলাম।

ক্লাস থেকে সবে ফিরেছি, ক্লান্ত ছিলাম-তবুও

চিঠিটা তখনই খুললাম।

পুরোটা দু'বার পড়লাম।

জানি, এ মুহূর্তে কষ্টে আছ-

কষ্ট তো জীবনে থাকবেই। আর নিজেকে এরকম

ভাবছ কেন? একা এবং বিপন্ন?

তুমি মোটেই একা নও। বিপন্ন তো নও-ই। কিংবা এভাবে বলা যায়- মানুষেরা সকলেই তো একা। নিজের কাছে নিজে সৎভাবে প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজলে সে বুঝতে পারবে সে কত একা। কিন্তু তাই বলে কি মানুষেরা হা হুতাশ করছে-

সমস্ত কিছু ফেলে রাত দিন বেহালার কান্না আগলে বসে আছে?

আমার কি মনে হয় জান- মানুষ আসলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা সম্ভাবনা। খুব অসহায় মানুষটিও মুহূর্তেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

কথাগুলো ভারী ভারী হয়ে উঠছে। তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আমার নিজের জীবনও তো কম বিচিত্র নয়- তুমি তো কম বেশি তা জানই- একবার সে সব কথা ভেবে দেখ-

ভেঙে পড়ো না।

জীবনকে উদারভাবে দেখ। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে গ্রহণ কর।

তোমার মা'র জায়গায় তুমি হলে কী করতে?

কতটুকু প্রতিদান সঞ্চয় করে রেখেছিলে তার জন্যে?

যা ঘটেছে এর চেয়ে আর কিছু সঠিক হতো না।

তুমি একবার বাসায় এসো। তোমার ভাবীর সাথে পরিচিত হওয়া যাবে। সে তোমাকে খুব প্রত্যাশা করছে। ভালো রেখ নিজেকে-

নিউটন স্যার

২৮/০৩/২০০২

আমি এই চিঠিটা পড়ি আর ভাবি জীবন আসলে অন্ধকার এক বলয়। সে বলয়ে কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। সে নিজে স্থির না চলমান- তাও তার এক জীবনে জানা হয় না। এ অন্ধকারে সে শুধু তার অনুভূতিগুলো নিয়ে বেঁচে থাকে। হয়তো ভালো থাকে, হয়ত খারাপ থাকে।

আর অন্ধকার মানে তো রাত্রি।

রাত্রিগুলো যত অন্ধকারই হোক না কেন আসলে তো তা নক্ষত্রময়।

PHILIPS